নারীর ভাষা ও গালিশব্দের সমাজতত্ত্ব

হাসান ইকবাল

Women are the only exploited group in history to have been idealized into powerlessness.

- Erica Jong

ভাষা সবসময় পরিবর্তনশীল। হাজার বছরের জারিকৃত পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা আর তার নিরিখে নির্মিত ভাষা দাঁড়িয়ে থাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিতের ওপর। আর বহমান সমাজ ও সংস্কৃতি যেহেতু নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, ভাষাও তাই পরিবর্তিত সময়ের দায়কে স্বীকার করে নিয়ে অনেক কিছু যেমন বর্জন করে, তেমনি নতুন কিছু আত্তীকরণও করে। ভাষার এই জীবন্ততাই ভাষার প্রাণ। এই প্রাণময় ভাষায় ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে গালি। প্রত্যেক সমাজব্যবস্থায়ই প্রচলিত রয়েছে গালি। মূল ভাষাস্রোতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হলেও গালি হয়ে উঠেছে ভাষার অঙ্গ।

আমাদের সমাজব্যবস্থার যে অর্থনৈতিক স্তরবিভাজন রয়েছে, তার নিচুস্তরের মানুষেরা যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গালাগাল করে থাকে, তেমনি পরিলক্ষিত হয় উঁচুস্তরেও। তাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জড়িয়ে পড়েছে এইসব গালমন্দ। গালমন্দের এইসব ভাষা সবসময় ভাষাতত্ত্বের কাঠামোতে সীমাবদ্ধ থাকে না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত বহু শব্দ বা শব্দগুচ্ছ আছে, যেগুলোকে ব্যাকরণ কিংবা ভাষাতত্ত্বের নিয়মের নিগড়ে বেঁধে রাখা যায় না। এই ভাষাজ্ঞান আমরা অর্জন করে থাকি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোধ থেকে। ভাষাবোধের এই সংস্কৃতিতে ভাষা হয়ে পড়েছে লিঙ্গ বিভাজিত— হয়ে পড়েছে নারীর ভাষা, পুরুষের ভাষা।

নারীর নিজস্ব কোনো ভাষা নেই। পুরুষাধিপত্যে নির্মিত ভাষাই নারীর ভাষা। স্ত্রীবাচক, নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দগুলো পুরুষের রুচিবোধ ও পুরুষশৈলীতে বিনির্মাণ করা হয়েছে। তাই এ প্রবন্ধের দুটো আলোচ্য বিষয়— ক. নারীর ভাষা এবং খ. পুরুষনির্মিত নারীর ভাষাগুলো কীভাবে গালিশব্দে রূপান্তরিত হয়ে নারীকে অবহেলা, হেয়, নিন্দা ও তাচ্ছিল্য করা অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কীভাবে গালিশব্দগুলোকে অবলীলায় প্রতিষ্ঠিত করেছে কিংবা এখনো করছে, সেই সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ভাষাতাত্ত্বিক পটভূমিও এ প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়। পাশাপাশি প্রচলিত কিছু গালিশব্দও এখানে আলোচিত হবে।

ব্যাকরণসম্মত শুদ্ধভাষা নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে ভাষার তত্ত্ব। ভাষার এই তাত্ত্বিক কাঠামোর ছাঁচে ফেলে সমাজনির্ভর ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞানকে বিচার করা যায় না। সমাজভাষাবিজ্ঞান সবসময় ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক বিচার করে এবং এক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও অন্যান্য প্রেক্ষিত থেকে বিচার করা সম্ভব। ভাষাতত্ত্বের বিচার্য বিষয় যেখানে ভাষার অন্তর্কাঠামো, সেখানে সামাজভাষাবিজ্ঞানের উপজীব্য বিষয় ভাষার বহির্কাঠামো।

১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে নবম আন্তর্জাতিক ভাষাবিদ সম্মেলনে পঠিত একটি প্রবন্ধে উইলিয়াম ব্রাইট ও এ. কে. রামানুজন সর্বপ্রথম Sociolinguistics পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। এর ঠিক দু'বছর পর ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাচক্রে হেনরি হেনিগসোয়াও লোকভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়নের প্রস্তাব রেখে A proposal for the study of folk-linguistics শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেদিন থেকেই লোকভাষাতত্ত্ব চর্চার যাত্রা শুরু। এই লোকভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো নিষিদ্ধ শব্দ ও গালাগালের ভাষা। গালাগাল ও নিষিদ্ধ শব্দাবলির মধ্যে নিহিত থাকে লৌকিক ঐতিহ্য, লোকমনস্তত্ত্ব এবং লোকজনের সামাজিক অবস্থান।

- ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত জনৈক ছাত্র যথার্থই বলে গেছেন, কোনো ভাষা সম্বন্ধে সার্বিকভাবে অবহিত হতে হলে ওই ভাষার স্ল্যাং ও অশ্লীল শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাঁর ভাষায়, It is impossible to acquire a thorough knowledge of any language without being familiar with slang and vulgarism.

বিশ্বের প্রতিটি দেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম্য-শহুরে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গালি প্রচলিত। তবে সামাজিক স্তরভেদে গালির ভাষায়ও পার্থক্য বিদ্যমান। শহুরে শিক্ষিত ও মার্জিত লোকের গালমন্দে যে রুচিবোধ থাকে, একজন নিরক্ষর গ্রাম্য লোকের গালিতে সেই রুচিবোধটুটু আশা করা যায় না। এর মূলে রয়েছে সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য। সামাজিক সম্ভ্রমবোধের কারণে শিক্ষিতজনেরা গালাগালের ভাষাকে ঘষেমেজে নেয়। একজন শিক্ষিত লোক যখন গালমন্দ করেন— কী অভদ্র! ওই একই গালি একজন নিরক্ষর লোকের মুখে যে রূপে বর্ষিত হয় তা হতে পারে এরকম— কী আচুদা! নিরক্ষর গ্রামীণ লোকজীবনে প্রচলিত গালাগাল ও নিষিদ্ধ শব্দাবলির প্রয়োগ অনেক সময় সহজ-সরল স্বতঃস্ফূর্ত হলেও তা হয়ে ওঠে অবদমনের হাতিয়ার। অনুরূপভাবে এটি ঘটে শহুরে নাগরিক জীবনেও।

গালাগাল ও নিষিদ্ধ শব্দে নিহিত থাকে বক্তার সমাজমানসিকতাজাত বিচিত্র অভিঘাত ও মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ সূত্র। জাপানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নারা 'নিষিদ্ধ শব্দ' সম্পর্কিত গবেষণাকে তাই A socio-psycho-linguistic field research নামে চিহ্নিত করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত সমৃদ্ধ ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষায় নিষিদ্ধ শব্দ ও গালিশব্দের ভাষা তথা লোকভাষা সম্পর্কিত সংগ্রহ-গবেষণা প্রায় নেই বললেই চলে। ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি ইত্যাদি ভাষায় প্রাসঙ্গিক গবেষণার সম্ভার ঈর্ষণীয়। সাপির, ম্যালিনোস্কি, ব্রুক, পার্টরিজ প্রমুখ এক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তবে

স্ল্যাং/গালিশব্দের সংগ্রহ ও চর্চার কাজটি শুরু করেছিলেন Copland, John Awdely এবং Thomas Harman ষোড়শ শতকে, যা সতেরো শতকের শেষের দিকে বেরিয়েছিল B. E. Gent-Gi সম্পাদিত A New Dictionary of the terms ancient and modern of the canting crew, in its several tribes of Gypsies, Beggars, Thieves, Cheats etc নামক সংকলনে।

১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বেরোয় Francis Grose-Gi Clossical Dictionary of Vulgar Tangue। এর বহুদিন পর ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় Eric patridge-Gi A Dictionary of Slang and Unconventinal English নামক সংকলনটি। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৭-৬১ এর মধ্যে পার্টরিজের অভিধানটির পঞ্চম পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এ যাবৎকাল পর্যন্ত এটিই ইংরেজি ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ অভিধানরূপে স্বীকৃত।

সাধারণভাবে স্ল্যাং/গালিশব্দ হলো এমন একটি শব্দভাণ্ডার, যেটি মূলভাষা-বহির্ভূত, অপ্রচলিত অর্থে প্রচলিত শব্দ, নতুন শব্দ, খণ্ডিত বা টুকরো শব্দ প্রভৃতি নিয়ে গঠিত। গালি অনাচারিত পরিবেশে ব্যবহৃত হয়, সবসময় অশালীন বা অশ্লীল না হলেও তথাকথিত ভদ্ররুচিগ্রাহ্য নয়। অধিকাংশ সময় গালিশব্দ নিন্দার্থে, তুচ্ছার্থে, হেয় করা অর্থে, নীচু অর্থে, অপমানসূচক অর্থে, অবদমন অর্থে এবং অধস্তন করে রাখার অর্থে প্রয়োগ করা হয়।

গালিশব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী H. W. Fowler-এর কথাগুলো এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য—

> সমাজের কিশোর-যুবকেরাই স্ল্যাং-এর স্রষ্টা। তারা অনেক সময় শব্দ নিয়ে খেলতে খেলতে নতুন স্ল্যাং শব্দ গঠন করে, কিংবা প্রচলিত মান্য শব্দকে ভেঙে বা বিকৃত করে স্ল্যাং শব্দের সৃষ্টি করে।

এ কথাটি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে গালি তৈরি হয়েছে পুরুষের হাত ধরেই। পুরুষ নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের অস্তিত্ব ও পৌরুষ প্রমাণের জন্য শব্দ, বাক্যে যাপিত জীবনে নারীর অমর্যাদা করে যাচ্ছে গালিশব্দের মাধ্যমে। সমাজে তারা লিঙ্গচিহ্ন নির্ধারণে, শব্দচয়নে ব্যবহার করে এমন সব শব্দ, যা কিনা নারীকে দোষারোপ করে। বাক্যের আবরণে বলা হয় নারী মায়াবতী, কিন্তু যে মায়াবতী নারী বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ তার পরিসর সংকীর্ণ। ভাষার প্রয়োগে অনেক মাপজোক, বিচার-বিবেচনা, নিয়মের রাজত্বে হাজারটা নিয়মের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত নারীকে প্রজাপতি বলা হলেও কেটে দেওয়া হয় তার ডানা। আর ডানাহীন প্রজাপতি হামাগুড়ি খায় পুরুষাধিপত্যবাদের রাজত্বে। তাই এই শব্দ ও শব্দবন্ধগুলো দেখে আমরা যেমন বিস্মিত হই, সাথে সাথে হই ক্ষুব্ধ; যেমন 'নারী কেলেঙ্কারি', 'মেয়েঘটিত ব্যাপার', 'নারীর শ্লীলতাহানি', 'নারীর ইজ্জত লুট' ইত্যাদি। এগুলো পুরুষমানসের অবচেতন মনের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং সচেতন মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থেকে প্রয়োগ হয়ে আসছে অনেক কাল ধরে। 'নারীকে উপর্যুপরি নির্যাতন' ধরনের বাক্য ব্যবহার করে পুরুষ জিতে যাবার আনন্দ অনুভব করে।

সমাজবিজ্ঞানী J. K. Chambers মনে করেন—

> কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করার সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে, বিশেষ করে ছেলেদের মধ্যে নিয়ম ভাঙার প্রবণতা, আচার-আচরণে এক ধরনের উগ্রতা এবং পারিবারিক অনুশাসন লঙ্ঘন করার প্রবণতা লক্ষ্যিত হয়, যার অভিব্যক্তি ঘটে ভাষার মাধ্যমে।

Chembers এগুলোকে অভিহিত করেছেন teenage slang বলে।

William Croft তাঁর Explaining Language Change: An Evolutionary Approach গ্রন্থে বলেছেন—

> One use of slang is to circumvent social taboos, as mainstream language tends to shy away from evoking certain realities. For this reason, slang vocabularies are particularly rich in certain domains, such as violence, crime and drugs and sex. An interesting fact about the word slang is that it was originally a slang term for the old French phrase `sale langue', which translated into English mean 'dirty language.

আমাদের পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় নারীর প্রতি শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাসে এখনো মানবিক হতে পারে নি পুরুষশাসিত সমাজ। আমরা দেখতে পাই যে, নারীকে যত না নানারকম হাতিয়ার দিয়ে নির্যাতন করা হয়, তার চেয়ে বেশি নির্যাতন করা হয় ভাষা দিয়ে। এখনো অনেকে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের সম্মান দিতে গিয়ে আরেক দফা ভাষিক নিপীড়ন করেন। তাঁরা বলেন, দু'লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত লুট করেছে হানাদার বাহিনী, রাজাকার ও তার দোসররা। সতীত্ব, ইজ্জত লুট এই শব্দগুলোর চয়নই আরেকবার সম্ভ্রমহানি ঘটায়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যে সকল বীরাঙ্গনা নারী শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, তাদের আবারও নির্যাতন করে যাচ্ছি আমরা অবজ্ঞাসূচক শব্দ ও বাক্যচয়নে।

আমাদের বোধোদয় কবে হবে! এখনো নারীর যোনি মাটির পাত্র বলে বিবেচিত, আর পুরুষের শিশ্ন অবিনশ্বর। এই ঈশ্বরত্ব দাবি করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। সমাজের প্রচলিত ভাষায় নারী হলো আজব বা অদ্ভুত জীব। অথচ এই অদ্ভুত জীবের পেটেই পুরুষেরা জন্মায়!

ভাষাসহযোগে নির্মিত আমাদের প্রতিদিনকার বাস্তব, আমাদের দৈনন্দিন বাস্তবতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে প্রতিদিনকার ভাষিক বিনিময়। সেই ভাষিক বিনিময়ের মাধ্যমে উৎপাদিত চিন্তাধারা ও তৎপরতা, ক্ষমতাশক্তির অপরাপর ধারাগুলোর সাথে এই চিন্তাধারার যোগসূত্র। আর তারই বিপরীতে মানুষের সহজাত ভাষা-ক্ষমতা, তার সৃজনশীল ভাষা তৈরির ক্ষমতার অসীম সম্ভাবনার কিনারে দাঁড়িয়ে সাধারণ একজন নাগরিক হিসেবে আমরা যে প্রতিবিশ্বের ছবি দেখতে পাই তা সত্যিই সুখকর নয়। সমাজে প্রবাহমান পুঁজি-প্রেষিত পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার যে আধিপত্য, ভাষা খোদ সেই আধিপত্যের

জমিনকে পোক্ত করতে থাকে তার নির্মিত অর্থ কিংবা নির্মিত জ্ঞানের মাধ্যমে। অর্থাৎ খোদ ভাষাই হয়ে দাঁড়ায় পুরুষতন্ত্রের দাস, আর তার বৃত্তে বৃত্তাবদ্ধ বন্দি নারী।

পুরুষতান্ত্রিক-ব্যক্তিসম্পত্তির যুগে 'পূর্বপুরুষ' নামের একটি শব্দ অভিধানে থাকলেও 'পূর্বনারী' বলে কোনো শব্দ নেই। পূর্বপুরুষ শব্দটির আভিধানিক অর্থ বংশের পিতৃপিতামহাদি, পূর্বগামী ব্যক্তিগণ। তা ছাড়া, পুরুষানুক্রম নামে একটি শব্দ পাওয়া যায় বাংলা শব্দাভিধানে, যার অর্থ বংশপরম্পরা। তার মানে আমাদের পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার উপস্থিতি যে সম্পদের ধারণা জারি রেখেছে, সেখানে নারীও পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং ভয়ঙ্করভাবে এই সত্যটি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে যে, দশমাস নিজের শরীরের মধ্যে আরেকটি শরীরকে একটু একটু করে বড়ো করে তোলা, তার অধিকাংশ প্রয়োজন মেটানো, তার দায়দায়িত্ব পালন করা, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তার সাথে প্রথম অনুভূতির বিনিময় যে শিশুর, সে শিশুর কোনো 'পূর্বনারী' নেই। সে শিশুর নেই কোনো নারীক্রম! যে শিশু কেবলই পরিচিত হয় পুরুষের পরিচয়ে। এই 'পূর্বপুরুষ'ক্রম নারীর প্রতি অবজ্ঞাজনক এক প্রথা। নারীর ওপর পুঁজিবাদী-পুরুষতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার যে আধিপত্য, পূর্বপুরুষ শব্দটি তারই প্রতিমা।

বাংলা অভিধানে 'মেয়েলী' আর 'পুরুষালী' শব্দের অর্থের মধ্য দিয়ে নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত ভিন্নতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সামাজিক অর্থ নির্মাণে মেয়েলি শব্দটি দিয়ে মেয়েদের আবেগী, যুক্তিহীন, কোমলপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য জানান দেওয়া হয়। অপরদিকে পুরুষালি শব্দটি দিয়ে পৌরুষ, শক্তি, ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। ভাষার রাজনীতিটা এখানেই। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, মেয়েরা আবেগ নিয়ে থাকবে, কোমল হবে, প্রতিবাদ করবে না আর পুরুষত্বসম্পন্ন পুরুষের অধীনস্ত থাকবে। তাই আমরা দেখি যে, কোনো ছেলে যদি কোমল বা বিনয়ী আচরণ করে, তখন তার স্বভাবকে 'মেয়েলি স্বভাব' বলে উপহাস করা হয়। আবার অপরদিকে মেয়েরা যদি বাইরে চলাফেরা করে, তর্ক করে, জোরে হাঁটে, সোজা কথায় পুরুষতান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করে, তবে তার স্বভাবকে 'পুরুষালি স্বভাব' বলে গালি দেওয়া হয়। তাই নারী এখনো অর্ধেক মানুষ। নারীকে একটি পরিপূর্ণ সত্তা হিসেবে পরিস্ফূটিত হতে দিচ্ছি না আমরাই।

একটি বাংলা ব্লগের নীতিমালা দেখলাম। তাতে লেখা আছে, 'নারী ব্লগারদের সঙ্গে কটাক্ষমূলক আচরণ করা যাবে না'। প্রশ্ন হলো, নারী কি তাহলে ভিন্ন কোনো প্রপঞ্চ! নারীকে আমরা একটি আলাদা সত্তা ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। নারীকে নিয়ে ভাষাগত এক লৈঙ্গিক রাজনীতি শুরু হয়েছে। নারীর ভাষা, রুচিবোধ এক হতে দেবে না এ সমাজ মানস। তাই বাংলা ভাষায় নেতিবাচক শব্দগুলো তৈরি হয়েছে প্রধানত নারীকে ঘিরেই।

আমাদের ভাষায় জেন্ডারভিত্তিক নিরপেক্ষতার বিষয়টি অনুপস্থিত। ভাষার নিয়মগুলো পরিকল্পনামাফিক তৈরি। তবে শুধু ভাষার পরিবর্তন করলেই সমাজের পরিবর্তন আসবে না। নারীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এমনসব অশ্লীল শব্দ যদি না থাকে বাংলা শব্দকোষে, তা হলেই বাঙালি সমাজে নারীর সম্মান বেড়ে যাবে, বিষয়টি এমনও নয়। প্রয়োজন সমাজবদ্ধ মানুষের ইতিবাচক পরিবর্তন। তবে বর্তমান সময়ে নারী ও পুরুষের প্রতি ভাষার আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবহার, শব্দচয়নে পুরুষের প্রতি ভাষার প্রবল পক্ষপাতিত্ব

এবং নারীর প্রতি ভাষার উদাসীনতার বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে প্রবলভাবে। একসময় মনে করা হতো, ভাষা কখনোই নারী কিংবা পুরুষের প্রতি আলাদা করে অবস্থান নেয় না। ভাষার অবস্থান লিঙ্গ-স্বতন্ত্র এবং ভাষানিরপেক্ষ। কিন্তু গত শতকের সত্তরের দশক থেকে ভাষা নিয়ে কিছু স্টাডি করে প্রধানত ইউরোপের নারীবাদীরা সবার চোখে আঙুল দিয়ে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেন, বর্তমান সময়ের ভাষা কোনো অবস্থাতেই লিঙ্গনিরপেক্ষ নয় এবং ভাষার ক্ষেত্রেও রয়েছে লৈঙ্গিক রাজনীতি। রয়েছে প্রবল পক্ষপাতিত্ব। অর্থাৎ ভাষা প্রবলভাবে পুরুষতান্ত্রিক।

গালিশব্দ থেকে শুরু করে নিত্যস্ত্রীবাচক শব্দগুলোর অধিকাংশই নারীকে অধস্তন করার মানসে চয়ন করা। নারীর প্রতি ভাষাগত এই বিভাজন লিঙ্গবৈষম্য তৈরি করেছে। পুরুষের পরিচর্যায় বাংলা শব্দভাণ্ডারে তাই যুক্ত হয়েছে যৌনতা, অশ্লীলতা এবং গালিশব্দের মতো অসংখ্য শব্দ— যা কিনা তৈরি হয়েছে কেবল নারীকে ঘিরেই। এসব শব্দের লিঙ্গান্তর করা যায় না। এটি অবশ্যই খেয়াল করার মতো একটি বিষয় যে, সমাজে নারীদের প্রতিই বেশি নোংরা শব্দ ব্যবহৃত হয়।

অসভ্য, অকথ্য এসব গালিশব্দের প্রায় প্রতিটিই নারীসংশ্লিষ্ট। নারীর জন্য অপমানজনক, অবমাননাকর শব্দাবলি উচ্চারণের মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের ক্ষোভ প্রকাশ করি। অশ্রাব্য ভাষায় নারীকে উপস্থাপন করি। তাই আমাদের অশ্রাব্য উচ্চারণও নারীকেন্দ্রিক তো বটেই, পুরুষসৃষ্ট যেকোনো অন্যায়ের জন্যও গালির ভাগ নারীকেই বহন করতে হয়। কী আশ্চর্য আর বিস্ময়কর!

তাই নারীর জীবনে অস্বীকৃতির প্রাচীন পাণ্ডুলিপি শুধু ভারীই হতে থাকে। অবহেলা, বঞ্চনা আর অপমান ছাড়া প্রাপ্তি খুবই নগণ্য। বলা হয়ে থাকে যে, নারীরা এখন শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক এগিয়ে। আগের দিন আর নেই। এসব গালিটালির দিন শেষ। এটা খুবই আশাব্যঞ্জক কথা। নারীরা এগিয়েছে, এগোচ্ছে, এগোবে আরো অনেকদূর। কিন্তু সেই এগোনোর পরিসংখ্যানটা আমাদের দেশের জনগোষ্ঠীর তুলনায় খুবই নগণ্য। বিশাল জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ নারী নিপীড়নের শিকার, যার কোনো জাতীয় পরিসংখ্যান আমার হাতে নেই। ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরেই নারী অকথ্যভাষার প্রেষণে জর্জরিত হয়— হয়ত সেটা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে। নারীর ভাষা, ভাষার মাধ্যমে অবদমন, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গালিশব্দ তথা পুরুষাধিপত্যের সামাজিক গবেষণা খুব একটা হয় নি আমাদের দেশে। তাই নারীর কান্নার যে অসংখ্য সমীকরণ, অসংখ্য অব্যক্ত বেদনার কাব্যগাথা, তা আমরা জানি না। জেন্ডার সংবেদনশীলতা চর্চার খুবই অভাব আমাদের সমাজব্যবস্থায়। যে কারণে নারী হয়ে ওঠে এক ম্যাজিক রিয়ালিজম। সংসারে নারী হয়ে ওঠে নিশ্চুপ এক নেপথ্যচারিণী।

এই নেপথ্যচারিণী নারীকে নিয়ে অল্পবিস্তর সমাজতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ টানা যেতে পারে। নারী মানে জরায়ু, নারী মানে ডিম্বকোষ। নারী মানে প্রথার জালে বন্দি বিবর্ণ প্রজাপতি। সমাজজীবনে নারীর অবদান নগণ্য বলে পরিগণিত হয়। কারণ একটি সমাজের দুটি স্তর থাকে— মূলকাঠামো বা বুনিয়াদ ও উপরিকাঠামো। সমাজের ভেতরে মানুষের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই তৈরি হয় তার বুনিয়াদ এবং বুনিয়াদের

ফলজাত প্রতিষঙ্গী হিসেবে গড়ে ওঠে উপরিকাঠামো। সুতরাং নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলশ্রুতি হিসেবে তৈরি হয় উপরিকাঠামোগত নানা ধরনের সামাজিক বৈষম্য।

সমাজের নারী-পুরুষের মধ্যকার নানা ধরনের বৈষম্যের মিলিত রূপ হিসেবে আবশ্যিকভাবে জন্ম নিল পুরুষতন্ত্র। আর নারী আক্রান্ত হতে লাগল নানা ধরনের সহিংসতায়। আদিম কৌম সমাজব্যবস্থার পর মানবজাতি ইতোমধ্যে ইতিহাসের কয়েকটি কালপর্ব বা ঐতিহাসিক গঠনরূপ (দাসতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা) অতিক্রম করে এসেছে। কিন্তু উৎপাদনের উপায়ের মালিকানায় তেমন কোনো হেরফের হয় নি। বরং পুরুষের মালিকানার ভিত্তি আরো মজবুত হয়েছে। আমাদের বর্তমান পুঁজিতান্ত্রিক সমাজেও আছে নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক বৈষম্য। এর কারণে তৈরি হওয়া অন্য নানা ধরনের সামাজিক বৈষম্যও টিকে আছে। এর মধ্যে পুরুষতন্ত্র তার হাজার বছরের পথ চলায় নিজেকে অনেক শক্তিশালী ও টেকসই করার প্রয়াস পেয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক অবস্থান টেকসই করার প্রক্রিয়ায় পুরুষ ভাষাকেও করায়ত্ত করে নেয়। ভাষাকে করায়ত্ত করে তারা নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

এ বিষয়ে বিস্তৃত সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের পাশাপাশি আরো গবেষণা হতে পারে। গালিশব্দের সমাজতাত্ত্বিক পাঠোদ্ধার, অধ্যয়ন এবং লেখনীর পাশাপাশি কিছু গালিশব্দের সাথে পরিচিত হওয়াটাও জরুরি। আপাতদৃষ্টিতে শব্দগুলো অশ্লীল, অকথ্য, অশোভনীয়, অভদ্র লোকের ভাষা, গালাগাল বা স্ল্যাং। সভ্যসমাজের বিচারিক মানদণ্ডে শব্দগুলোর অবস্থান অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু সভ্যসমাজেই এই শব্দগুলো প্রয়োগ ও এর প্রতিনিধিত্ব করছে পুরুষ। বাইরের সভ্য-সুশীল মুখাবরণের খোলসের পেছনে জায়গা করে নিয়েছে হীন, নিচ, নিকৃষ্ট, অশ্লীল শব্দভাণ্ডার। এসব শব্দের বিস্তৃতি এতটাই বেশি যে, এ নিবন্ধের কলেবরে সবটার স্থান সংকুলান সম্ভব নয়। এর মধ্যে কিছু শব্দ এখানে তুলে ধরা যাক :

১. আটকপালি

মন্দ কপাল, দুঃখবতী নারী (গালিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়)।

২. একতলা ভাড়া দেওয়া

গর্ভবতী হওয়া (তুচ্ছার্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়)।

৩. কচি

ছোট, কিশোরী মেয়ে। শব্দটি যৌনতার সাথে সম্পর্কিত করে ব্যবহার করা হয় গালিশব্দে; যেমন, কচি মাল।

৪. কড়া মাল

শক্তপোক্ত মেয়ে, কালো মেয়ে কিন্তু চেহারাটা দারুণ।

৫. কম্‌লি

সুন্দরী বা যুবতী মেয়ে।

৬. কম্পানির মাল

বেওয়ারিশ বস্তু, অন্যের সম্পত্তি— যার জন্য খরচ করতে হয় না। নারীর দেহকে সস্তা ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচনা করে শব্দটি তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়।

৭. কলমি

মোটা নিতম্বের নারী। তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয় শব্দটি।

৮. কামিন চোদা

নারী শ্রমিক, বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তি।

৯. কুনকি

বেশ্যা, পতিতা। নারীর প্রতি নিন্দার্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

১০. কুরুপ্পুর

কুরূপা নারী, নিন্দার্থে ব্যবহৃত।

১১. কুলটা

বেশ্যা, ব্যভিচারিণী, নিন্দার্থে ব্যবহৃত।

১২. খিড়কি

মেয়েদের পোশাকের ফাঁক, যা দিয়ে শরীরের কোনো অংশ দেখা যায়। নিন্দা ও তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত শব্দ।

১৩. খেঁদি

অপছন্দসই মেয়ে, নিন্দার্থে ব্যবহৃত।

১৪. গামলা

আভিধানিক অর্থে মাটির পাত্র, যাতে ভাতের ফ্যান ফেলা হয়। কিন্তু তুচ্ছার্থে নারীর যৌনাঙ্গকে বোঝায় এবং গালিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১৫. গিরিপথ

তুচ্ছার্থে গালিশব্দ হিসেবে নারীর যৌনাঙ্গ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

১৬. ঘরওয়ালি

যিনি ঘরের মালিক; যেমন, বাড়িওয়ালি। বাড়িওয়ালার স্ত্রীলিঙ্গ বাড়িওয়ালি আর ঘরওয়ালার স্ত্রীলিঙ্গ ঘরওয়ালি। প্রকৃতঅর্থে, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মালিকানাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেনে নেয় না। সেজন্য তুচ্ছার্থে গালিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি পতিতালয়ের মাসিকেও ঘরওয়ালি বলে, যার নিয়ন্ত্রণে একাধিক মেয়ে থাকে।

১৭. ঘাটিয়া

বাজে, নোংরা।

১৮. ঘুস্‌কি

অসতী গৃহস্থ স্ত্রী।

১৯. চামকি

চমকপ্রদ সুন্দরী মেয়ে। নারীর সৌন্দর্যকে নিয়ে অনেক সময় প্রতিহিংসাপরায়ণতায় ভুগে তাকে নিয়ে পরিহাস করা হয়। সৌন্দর্যকে অস্বীকার ও তাচ্ছিল্যের বিষয়ে পরিণত করতে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

২০. জবাকুসুম

মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব। প্রাকৃতিক এই বিষয়টিকে তাচ্ছিল্যের সাথে দেখতে এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

২১. ছোটো মাল

আভিধানিক অর্থে মদের ছোট বোতল কিংবা ছোট জিনিস বোঝায়। কিন্তু ব্যঙ্গ করে খাটো যৌবনবতী মেয়েদের প্রতি তুচ্ছার্থে এই সম্বোধন প্রয়োগ করে পুরুষশাসিত সমাজ।

২২. জিনিস

আভিধানিক অর্থে কোনো জিনিসপত্র। কিন্তু সুন্দরী মেয়েদের কামুকতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুরুষসমাজ 'জিনিস' শব্দটি বলে থাকে।

২৩. ঝাঙাবিচি

পাকা, ডেঁপো; তুচ্ছার্থে।

২৪. টমেটো সস

মাসিক ঋতুস্রাবের সময় নিষ্কাশিত রক্ত, তুচ্ছার্থে।

২৫. টাইট মাল

যৌনতাপূর্ণ বাজে মন্তব্য। যৌবনবতী অল্পবয়সী মেয়েদের বোঝাতে তুচ্ছ ও ব্যঙ্গার্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

২৬. টুস্‌কি

সুন্দরী মেয়ে।

২৭. ট্যাপারি

সুন্দরী মেয়ে।

২৮. ডব্‌কা/ডবকা মাল

যৌবনপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যবতী নারী।

২৯. ডাবল ডেকার

গর্ভবতী নারী, তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত।

৩০. ডাঁসা মাল

যুবতী, যৌবনপ্রাপ্ত মেয়ে।

৩১. ডিমপাড়া মুরগি

গর্ভধারণ ও বাচ্চা জন্মদানে সক্ষম নারীদের বোঝাতে তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয় এই গালিশব্দ।

৩২. তানপুরা

পশ্চাদ্দেশ, পাছা। বিশেষভাবে প্রসারিত নিতম্বের অধিকারী নারীদের বোঝাতে ব্যঙ্গার্থে তানপুরা বলা হয়ে থাকে।

৩৩. দুলকি

নিতম্বিনী। হাঁটার সময় পশ্চাদ্দেশ ওঠানামা করা যুবতী মেয়েকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

৩৪. ধাঁড়ি মেয়ে

প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে, কিন্তু এখনো বিয়ে হয় নি; এরকম অর্থে ব্যবহৃত হয় শব্দবন্ধটি।

৩৫. ধানি লংকা

দজ্জাল, অতিরিক্ত ঝাল নারীকে বোঝাতে নিন্দার্থে ব্যবহৃত।

৩৬. ধিঙ্গি

প্রাপ্তবয়স্কা, লজ্জাহীনা, উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। 'অত বড় ধিঙ্গি মাইয়াডারে অতডা বাড়তে দেওয়া উচিত হয় নি।'

৩৭. নিম্‌কি

সুন্দরী মেয়ে।

৩৮. পট্টী

ঋতুমতী মেয়ের ব্যবহৃত প্যাডকে পট্টি বলে।

৩৯. প্যাটিস খাওয়া

প্রেমে প্রত্যাখ্যাত বা প্রতারিত হওয়া।

৪০. ফানটুশ

সুন্দরী মেয়ে।

৪১. ফুটানি

অহংকারী মেয়ের ভাব বোঝাতে ব্যবহৃত।

৪২. বাতাবি লেবু

স্তন, সাধারণত বৃহদায়তন স্তন বোঝাতে ব্যঙ্গার্থে এই গালিশব্দটি ব্যবহৃত হয়।

৪৩. বিল্লি

সুন্দরী মেয়ে।

৪৪. বুটকি

নারীর স্তন।

৪৫. বেবি

সুন্দরী মেয়ে।

৪৬. বোমা

আকর্ষণীয় সুন্দরী মেয়ে।

৪৭. ভাতি

সুন্দরী মেয়ে বোঝাতে টিজারদের ভাষা।

৪৮. ভুসি মাল

নিতান্ত অপদার্থ, অকর্মণ্য বোঝাতে তুচ্ছার্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

৪৯. ভেটকি

যার মুখ ভেটকে থাকে; তুচ্ছার্থে।

৫০. যটকী

মাটির তৈরি আসবাব। মোটা মেয়ে বোঝাতে তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়।

৫১. মাকড়ি

সুন্দরী মেয়ে।

৫২. মারুতি গাড়ি

আকর্ষণীয় যৌবনবতী মেয়ে বোঝাতে তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত শব্দ।

৫৩. মিনিমাল

কিশোরী মেয়ে।

৫৪. রসগোল্লা

যৌবনপ্রাপ্ত মেয়ে।

৫৫. লুচি

নারীর স্তন।

৫৬. অস্‌মান কবুতর

নারীবক্ষ।

৫৭. আইটেম

আইটেমটা ভালো, ডাঁসা। বিকৃত যৌন ইঙ্গিত করতে বলা হয়।

৫৮. আল্‌কাতরা

কালো গাত্রবর্ণবিশিষ্ট নারী।

৫৯. খাপ্‌রি

সুন্দরী নারী।

৬০. চিংড়ি

উঠতি যুবতী

৬১. ফ্লাইং

বাইরে থেকে আসা অস্থায়ী যৌনকর্মী।

৬২. যুতের মাগী

সম্বন্ধ স্থাপনের উপযুক্ত নারী।

৬৩. টৌল্‌নি

মেয়ে।

৬৪. ধ্যাকা মাইয়া

অবিবাহিত নারী।

এসব শব্দ অধিকাংশ সময় আঞ্চলিক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজিতে প্রতিবর্ণীকরণ করে ব্যবহার করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে এসব শব্দের আভিধানিক ভাবার্থ, শব্দার্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। পুরুষ তাদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য, যৌন লালসা নিবৃত্তির জন্য শব্দগুলোকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। কিছু শব্দের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রকৃতঅর্থে শব্দগুলোর ইতিবাচক ও ভালো অর্থ রয়েছে। কিন্তু নারীকে হেয় করার জন্য বিকৃত ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিছু শব্দ খাবারদাবার, গাড়ি, বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ, আসবাবপত্র, বাদ্যযন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত; কিন্তু ব্যবহার করা হয় খারাপ অর্থে; যেমন, চিংড়ি, আলকাতরা, কবুতর, লুচি, রসগোল্লা, মটকী, ভুসিমাল, বিল্লি, বাতাবিলেবু, টমাটো সস, ডিমপাড়া মুরগি, তানপুরা, জবাকুসুম, গামলা, কলসি, ইত্যাদি। এই শব্দগুলোর সাথে কিছুটা যৌনতার আবেদন জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে এমন উপমাসূচক শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এখানে একইরকম উদ্দেশ্যে তৈরি ও প্রযোজ্য আরো কিছু শব্দ উল্লেখ করছি—

থাম : মেয়েদের উরু

যুরি : বৃদ্ধমহিলা

উত্তা : সুন্দরী

অশোক ফুল : ঋতুবতী মেয়ে

ট্যাপারি : মেয়ে

বোঁটা কাটা বেলফুল : স্তনবৃন্ত

সাইনবোর্ডওয়ালা : বিবাহিতা মহিলা

কদ্‌মা : মেয়ের বুক/স্তন

কামোরবাজ : যে নারী যৌনকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে

কাঁচা দেয়াল : যৌনকর্মে নবাগতা

বালিশ : মেয়েদের পাছা

পুসকুনি : স্ত্রী যৌনাঙ্গ

আমরা সভ্য-গালিহীন সমাজব্যবস্থা দেখতে চাই। কিন্তু গালি অন্যায়, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা, অপ্রাপ্তি অসাম্যেরই গর্ভজাত। পুরুষাধিপত্যের দুনিয়ায়ও গালির বিনাশ সম্ভব। কিন্তু তার আগে আমাদের নিজেদের বদলাতে হবে। তা না হলে নারীর ভাষা, নারীর রুচিবোধ, নারীর কোনো কিছুরই মূল্য থাকবে না। পুরুষের ভাষা কেবল নারীর অবদমনেই ব্যবহৃত হবে।

অবশ্য একথা এখানে প্রতিনিধানযোগ্য যে, যতদিন সমাজে শোষণ-বঞ্চনা থাকবে, গালিও থাকবে তার ভাঁজে ভাঁজে। তবে আমরা চাই, অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণে গালি নিপীড়নের হাতিয়ার না হয়ে হয়ে উঠুক প্রতিরোধের হাতিয়ার।

আমাদের সংস্কৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে পুরুষশাসিত গালিশব্দ। তা মোটেও নারীবান্ধব কিংবা নারীর ভাষা নয়, যে প্রেক্ষাপটে স্ল্যাং বা গালির সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই এ প্রবন্ধে সমগ্র প্রাসঙ্গিকতা টেনে গালির বৃত্তান্ত তুলে ধরা সম্ভব হয় নি বলে একটা অতৃপ্তি রয়েই গেল। পাশাপাশি সাহিত্যে-নাটকে-সাংস্কৃতিক পরিচর্যায় যে গালির বহর পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিস্তৃতি লাভ করেছে সে নিয়েও আলোকপাত জরুরি ছিল। তবে এ প্রবন্ধে কিছুটা সমাজতাত্ত্বিক অবয়বে নারীর সাথে সম্পৃক্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়টির প্রতিই কেবল গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

গালির সামগ্রিক বিশ্লেষণে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, এসব গালি আমাদের কুণ্ঠিত করে, বিব্রত করে, অপমানিত করে, হেয় করে। যা কিনা যুগের পর যুগ নারীর বিরুদ্ধে একতরফাভাবে প্রযোজ্য হয়ে আসছে। কিন্তু বুঝে বা না বুঝে আমরা তা আজো ব্যবহার করে চলেছি অবলীলায়।

মনের বলে সংগোপনে অনেক মাগিই করেছে ছেনালী
পড়শী মেয়ে পা ফসকালে তারাই দিচ্ছে গালি।
মরদরাও সব সুযোগমতো করছে মাগিবাজী,
নালিশ করে, সালিশ করে, তারাই সাজে কাজী।

[অকথ্য পঙক্তিমালা/জাহাঙ্গীর খান]

কথ্যভাষার গালি যখন কাগজে মুদ্রিত হয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে চোখের সামনে, সত্যিই বেমানান লাগে সবার কাছে। সেই বেমানান, বড্ড বেমানান বিষয়টিকে আমরা যেন মানানসই করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছি। তাই আমাদের সংশোধনের সময় এসে গেছে। আসুন আজ থেকেই নারীর বিরুদ্ধে এসব শব্দের ব্যবহার বন্ধ করি।

হাসান ইকবাল প্রাবন্ধিক ও উন্নয়নকর্মী। একটি স্প্যানিশ উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত। hasan_netsu@yahoo.com

সহায়ক তথ্যপঞ্জি

১. স্বপন, আবদুল মান্নান সম্পাদিত, *ধমনি-গালি সংখ্যা*, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

২. গোস্বামী, সত্রাজিৎ, *বাংলা অকথ্য ভাষা ও শব্দকোষ*, ২০০৬, একবিংশ, কলকাতা।

৩. মল্লিক, ভক্তিপ্রসাদ, *অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ*, ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৪. বসু, অভ্র, *বাংলা স্ল্যাং : সমীক্ষা ও অভিধান*, ২০১২, প্যাপিরাস, কলকাতা।

৫. দাস, রমাকান্ত, *আসামের বরাক উপত্যকার নিষিদ্ধ শব্দ ও গালাগালের ভাষা (প্রবন্ধ)*, ধমনী, প্রাগুক্ত।

৬. ভট্টাচার্য, শাশ্বত, *গালি : প্রেক্ষিত রংপুর অঞ্চল (প্রবন্ধ)*, ধমনী, প্রাগুক্ত।

৭. নাথ, মৃণাল, *ভাষা ও সমাজ*, ১৯৯৯, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

৮. সরকার, পবিত্র, *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, ২০০৩, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্জুন, *স্ল্যাং : আমাদের বড় নদী*, অজিত রায় সম্পাদিত শহর, ঝাড়খণ্ড, জুলাই ২০১৩।

১০. গুপ্ত, পল্লব সেন, *লৌকিক গালমন্দ : সমাজ-মনস্তত্ব ও রূপতত্ত্ব*, সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত বাংলা লোকভাষা বিজ্ঞান, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ২০০১, কলকাতা।

১১. ইকবাল, হাসান, *ভাষা, নারী ও পুরুষপুরাণ (প্রবন্ধ)*, ১০ জুলাই ২০১৩, নারী বিভাগ, প্রিয় ডট কম।

১২. শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ, প্রধান সম্পাদক, *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, ১৯৬৫, বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা।

১৩. Haas, Adelaide, *Male and female spoken language differences: stereotype and evidence*, American Psychological Association Bulletin, 1979, vol- 86, No-3 (page- 616-626).

১৪. Lakoff, Robin, *Language, Gender and politics: puting "women" and "power" in the same sentence*, The handbook of language and gender, Edited by Janet Holmes and Miriam Meyerhoff, 2003 : Blackwell publishing Ltd. UK.

১৫. Keashly, Loraleigh and Harvey, Steve, *Workplace emotional abuse*: Phd thesis paper, Sage publication

১৬. Ali, Ghulam and Khan, Lubna Sklaq, *Language and Construction of Gender: A Feminist Critique of Sms Discourse*, British journal of arts and social science, Vol 4, No 2 (2012)